উৎস মানুষ

২৯ বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • জানুয়ারি ২০০৯

যাঁরা লিখেছেন

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামল ভদ্র
সমর বাগচী	সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুজয় বসু	মৈনাক মুখোপাধ্যায়
মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	রবীন চক্রবর্তী
জয়া মিত্র	মধুসূদন দত্ত
অমিত চক্রবর্তী	শ্যামল দানা
যুগলকান্তি রায়	ভবানীপ্রসাদ সাহু
আশীষ লাহিড়ী	সৌমিত্র শ্রীমানী
বজলুর রহিম	প্রভাত সিংহরায়
নিরঞ্জন হালদার	সৌমেন নাগ
নিরঞ্জন বিশ্বাস	উৎপল সান্যাল
অমিত সান্যাল	পবন মুখোপাধ্যায়
সুশান্ত মজুমদার	নিবারণ সাহা
ভূপতি চক্রবর্তী	গৌতম রুদ্র
ভবেশ দাস	বরুণ ভট্টাচার্য
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	সমীরকুমার ঘোষ

এছাড়াও

সম্পাদকীয় ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা
সম্পাদকীয় - দশম বর্ষপূর্তি
সম্পাদকীয় - ২১ বর্ষ প্রথম সংখ্যা
পুনর্মুদ্রণ: এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ দাবি কি বাঁচার দাবি ?

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অক্ষরবিন্যাস ও অলঙ্করণ: স্বপন দত্ত ও সুবীর ঘোষ।

উৎস মানুষ
ISSN 0971-5800
বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪
ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৬২/২৫৩১ ০৯১৩
ই-মেল: jhilly_banerjee@yahoo.co.in
ওয়েব সাইট: www.utsamanush.com

অপ্রিয় কাজটা !

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভীষণ অপছন্দের কাজটা করে ফেলল উৎস মানুষ। অবিশ্যি তাকে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি যে শুধু তার পছন্দমতো কাজই উৎস মানুষকে করে যেতে হবে। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ! শুধুই তাকে নিয়ে ! তবে অপ্রিয় কাজও তো কাজই বটে — কখনো কখনো করতে হয় বই কি !

উৎস মানুষ ছিল তার বাঁচার একমাত্র প্রেরণা। সে আঁকড়ে ধরেছিল উৎস মানুষকে, আর উৎস মানুষ তাকে। কোনো বড় দলের, বড় প্রতিষ্ঠানের বা বড় মানুষের সাহায্যের তোয়াক্কা না করেই সেই ১৯৮০ থেকে একটানা পথ চলা। মাঝে অবশ্য ছোট্টো একটু বিরতি। এককথায় অবিশ্বাস্য ! কতটা গভীর ভালোবাসা ও দরদী মন নিয়ে একটা পত্রিকার ভালো মন্দের সঙ্গে মানুষটা জড়িয়ে ছিল, প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল, এ আমরা খুব কাছ থেকে দেখেছি। তো, সেই মানুষটার প্রাণের উৎস মানুষ তাকে কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, বুকভরা ভালোবাসা জানাবে না ? শুধুই হায়-হায় করে বুক চাপড়াবে ?

ভক্তিতে গদগদ হয়ে ঢিপ্ করে প্রণাম করলুম, দু-চারটে ভালো-ভালো কথা লিখে দিলুম, আর তা ছেপে দিলুম ! এমন মানসিকতা নিয়ে লেখা এই সংখ্যায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা যারা লিখেছেন, তাদের অধিকাংশই উৎস মানুষের পাঠশালার বেঞ্চে কোনো না কোনো সময় বসে গেছেন। কেউ টানা বেশ কয়েক বছর, কেউ বা অল্প সময়। উৎস মানুষ ঘরানার বহু মানুষের আবেগ, উৎসাহ ও সহযোগিতাকে সম্বল করে, চাহিদাকে সম্মান জানিয়ে এই সংখ্যাটি বের করা হল। বেশির ভাগ লেখা প্রায় হুবহু ছেপে দেওয়া হয়েছে, মাজা-ঘসা করা হয়নি বললেই চলে। বিশেষ করে সেই সব লেখাগুলি, যাতে স্তুতি নেই, বরং এমন কিছু কথা আছে যা হয়তো বা একটু অন্য সুরে বাঁধা।

উৎস মানুষের একটা নিজস্ব চরিত্র আছে, যার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যাপারে আমরা বেশ আশাবাদী। কিছুটা উগ্রবাদীও বটে। কারণ এটা একটা পরম্পরা। বিরূপ মন্তব্য ছাপব না, বিপরীত মত হলেই তা গ্রহণ করব না— এমন মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত মতই প্রকাশ করেছেন। আমরা তা অবিকৃত রেখেছি। দুঃখের কথা, অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। সময়মতো লেখাও পাওয়া যায়নি।

লেখাগুলি পাঠকের কৌতূহল কতটা মেটাবে, বা আদৌ মেটাতে পারবে কি না, জানি না। তবে আমাদের কাজটাকে অবসর বিনোদনের প্রয়াস বলে না ভাবলেই খুশি।

পরিশেষে আরেকটা কথা। অশোকদার মৃত্যুর পর বহু স্মরণসভা হয়েছে, হচ্ছে। সেই সঙ্গে একটা চাপা প্রশ্ন, বিদ্রূপের চাউনিও উৎস মানুষের দিকে ছুটে আসছে অশোকদার মরণোত্তর দেহদান নিয়ে। গভীর হতাশা ও দুঃখের সঙ্গে আমরা এটুকুই বলতে পারি, অশোকদার মেধা ও শ্রমের ওপরেই উৎস মানুষের একচেটিয়া অধিকার ছিল। শরীরটা তার পরিবারেরই সম্পত্তি।

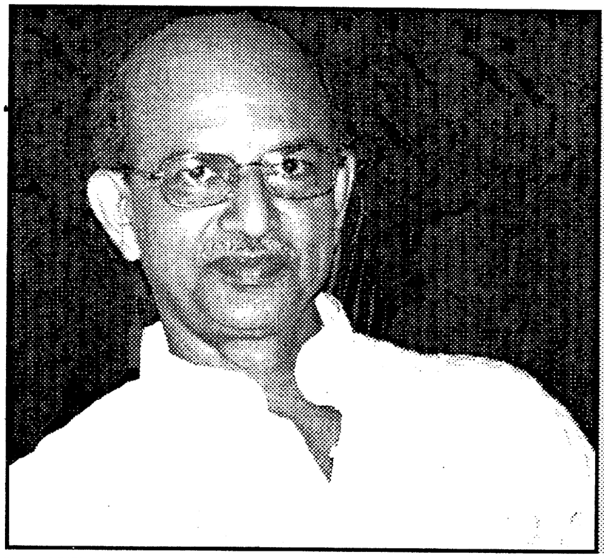

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫০
মৃত্যু : ১৭ নভেম্বর ২০০৮

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় জানুয়ারি, ১৯৮০

"তত্র ভেরী সহস্রাণি শঙ্খনামযুতানি চ,
বাদয়ন্তিস্ম সংহৃষ্টা সহস্রাযুতশো নরাঃ ॥"

(মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব)

নতুন দশকের নতুন বছরের নতুন মাসের নতুন দিনে আমাদের পথচলা শুরু। যাত্রাপথ সেই বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্র জুড়ে যেখানে প্রকৃতির বুকে মানুষের গড়া সমাজে প্রতিনিয়ত চলেছে বেঁচে থাকার লড়াই—সেই রণক্ষেত্রে এই বিজ্ঞান পত্রিকাকে হাতিয়ার করে সৈনিকের ভূমিকায় আমাদের অনুপ্রবেশ।

এই মুহূর্তে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ নিয়ে সারা পৃথিবী সক্রিয়। ছোটবড় রাষ্ট্রশক্তিগুলির মধ্যে সাড়ম্বর বিজ্ঞানচর্চার উন্মত্ত প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু সে তুলনায় বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের সামাজিক চেতনা, যুক্তিনির্ভরতা আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কাজে বিজ্ঞান কোন্ ভূমিকা পালন করছে? বলা যায় প্রায় নিষ্ফলা, বন্ধ্যা। তা না হলে এই বিংশ শতাব্দীর সাতটা দশক পার করেও কেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বেশির ভাগ মানুষ কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, অদৃষ্টবাদ আর অতীন্দ্রিয়বাদের শিকার হয়? হাঁচি টিকটিকি অশ্লেষা মঘা মানত কিরের কথা বাদই দিচ্ছি, প্ল্যানচেট জন্মান্তরবাদ মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক কবচ তাবিজ—এইসব কেন অনায়াসে বিশ্বাস করি আমরা প্রমাণটমান ছাড়াই? কোন্ বৈজ্ঞানিক কারণে বহু ডিগ্রিধারী প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর হাতেও পলা নীলা পোখরাজ ধারণ করা থাকে? ভুঁইফোড় 'বাবা'দের ভেল্কিবাজি আর আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি অন্ধ ভক্তিকে মূলধন করে কত ভণ্ডামি, প্রতারণা, যৌনাচার আর নৈতিক অধঃপতনের রাস্তা পরিষ্কার হয়, দেখা যায় সর্বত্র, তবুও তাদের প্রভাব বাড়ে বই কমে না কেন? প্রকৃতির বুকে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন কি কৌশলে হয়ে যায় "গ্রহান্তরে আগন্তুকের" স্বাক্ষর! "কপালের লিখন" কেন শত শত মানুষকে বিভ্রান্ত পঙ্গু করে রাখে আজীবন?...এসবের মূলে সেই মোহাচ্ছন্ন মূঢ় বিশ্বাস আর অন্ধ গ্রহণীয়তার ক্লেদ যাকে তাড়িয়ে ব্যক্তিমানুষের সংস্কৃতিবোধকে মুক্ত, পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব বিজ্ঞান পালন করেনি, যদিও রাষ্ট্রশক্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে প্রচুর। সমস্ত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানসেবী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বার্নাল, হ্যালডেনের মতো সমাজসচেতন বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত বলে গেছেন উচ্চকণ্ঠে, সেই পবিত্র দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নির্লজ্জ পলায়নী প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় আজ অতি দুঃখের সাথে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের এক একটা আত্মকেন্দ্রিক যন্ত্র তৈরি করে। সমাজ নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীই শাসন-শোষণের স্বার্থে কুসংস্কার, ভাগ্য আর দৈবনির্ভরতাকে নানা কৌশলে জিইয়ে রাখে। আর এরই জন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস আর অন্যান্য মানবিক গুণাবলী সুস্থভাবে গড়ে ওঠে না, জন্ম নেয় সংকীর্ণতা দুর্বলতা বিদ্বেষ আর অসংহতি। ...এই অন্তর্লীন ভয়ঙ্কর রোগসংক্রমণের বিরুদ্ধে তাই ব্যাপক বিজ্ঞান-আন্দোলন প্রয়োজন, যা মানুষের সুপ্ত চেতনাকে সজাগ করবে। এ এক যুদ্ধ। অতি দুরূহ দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ। ব্রতসাধনার সূচনার কাজে গণ্ডূষ প্রমাণ কর্মপ্রচেষ্টারও মূল্য আছে, তাই আমরা পথে নামার ভরসা পাই। জীবন ক্রমশ জটিলতর হচ্ছে। সেখানে প্রাত্যহিক জীবনে জড়ানো বিজ্ঞানের ন্যূনতম জ্ঞান আর একটা পরিচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই শুধু বেঁচে থাকাকে সহজ এবং সুস্থ করতে পারে—এই বিশ্বাস নিয়ে নতুন দশকের নতুন বছরের নতুন মাসের নতুন দিনে আমাদের পথচলা শুরু।

দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত
১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯

আমাদের কথা

বার্লিনের অনড় প্রাচীর অবশেষে নড়ে যায়, ভেঙে যায়। শেকল ভাঙে পূর্ব বার্লিনের মানুষ। হাজার লক্ষ সাধারণ মানুষ।...মুক্তিকামী মানুষের এটাই বোধহয় নবতম রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

সেইরকমই অনড় হলো ধর্মবিশ্বাসের দুর্গ। অন্ধ, বদ্ধ, স্থবির। সেখানে জিজ্ঞাসা নেই, প্রশ্ন নেই, প্রমাণ চাইবার সুযোগ নেই। ঐতিহ্য আর সনাতনের প্রতি অন্ধ ভক্তি, রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য—সেখানেও যেন একই বদ্ধতার আভাস। ধর্মের নির্দেশ আর তত্ত্বের আরোপণ—মৌল চরিত্রে কি এক নয়? এক অমোঘ অচলায়তনের নিগড়ে বেঁধে রাখছি না কি আমরা আমাদের মনকে, চেতনাকে, অভ্যাসকে?

কিন্তু মানুষ তো ভাবে, চিন্তা করে, বিভ্রান্ত হয় আবার শূন্যতা ভরাতেও চায়! মানুষের চেতনা বিকাশের ইতিহাস তো আগাগোড়াই গতিশীল! আর সেই কারণেই বোধহয় ইতিহাসে এমন সব ঘটনা হঠাৎ করে ঘটে যায়, যা গল্পের থেকে বেশি চমকপ্রদ। তখন অবস্থা পাল্টায়, মন মুক্ত হয়, ধারণা ভাঙে। ঠিক যেমন ভাঙে বার্লিনের দেয়াল...ভাঙে...আর ভাঙে...আর, আবারও গড়ে অন্যভাবে।

এইখানেই গহীনে গোপন হয়ে আছে উৎস মানুষ-এর কোরক-কেন্দ্র; মানুষের এই মন, দ্বন্দ্ব, সংশয় আর সঠিক চিন্তায় উত্তরণের প্রক্রিয়া, বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া।

মানুষের মুক্ত চিন্তার জমি যদি পতিত হয়ে পড়ে থাকে, যদি খাঁচায় 'তোতা'কে পুরে রেখে দিস্তা দিস্তা ছাপানো ফর্মা গুঁজে দেওয়া হয় তার মুখে, যদি দম আটকানো রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাতাবরণের মধ্যে থেকে বহু-চর্চিত সুখশ্রাব্য নীতিবাক্য আর বিবর্ণ স্লোগান-সর্বস্ব শব্দের জালে আটকে থাকে মন, তাহলে?...তাহলেই অন্ধকার অবক্ষয় আর হতাশার বাতাস বিরাজ করে যেন। তাই উৎস মানুষ চেয়েছিল চিন্তায়, মানসিকতায়, দৃষ্টিভঙ্গিতে মুক্তির গতি নিয়ে আসতে, চেয়েছিল জীবনের সর্বস্তরে দেখে-শুনে-বুঝে-বিচার করে নেওয়ার অভ্যাস গড়তে, চেয়েছিল তত্ত্ব থেকে ফর্মুলা দিয়ে সিদ্ধান্ত কষে নিতে নয়, বরং অভিজ্ঞতা আর ঘটনার জায়গা থেকে তথ্যের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে হাজির হতে। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং জীবন-যাপনের প্রতি ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা, এই ছিল উৎস মানুষ-এর অস্তিত্বের তাৎপর্য।

উৎস মানুষ-এর চোখে ছিল সবুজের স্বপ্ন। এ হয়তো সাগরপারের সেই 'গ্রীন' বা 'সবুজ আন্দোলনে'র অভিনব তরঙ্গটি নয়, গোটা য়ুরোপ জুড়ে প্রচলিত ডান-বাম রাজনৈতিক-সামাজিক বদ্ধ-গলির ভেতর থেকে সবুজ আশ্বাসের সেই দমকা হাওয়াই হয়তো উনিশ-শ' পত্রিকার দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯-এ স্যার আর এন মুখার্জি হলে, কলকাতায়। আশির প্রথম (উৎস) মানুষ প্রকাশনার পালে আনুষ্ঠানিক গতি দেয় নি, কিন্তু এটা বোধহয় ভুল ভাবা হবে না যে, সেই ঐতিহাসিক সময়টাতে, প্রচলিত বোধ আর ধ্যান-ধারণায় নাড়াচাড়া পড়ার অধ্যায়টিতে, উৎস মানুষ-এর একান্ত লালিত চিন্তা আর বোধ-এর জায়গায় কিছু সমতা বা সাযুজ্য হয়তো ছিল, হয়তো ছিল কিছু সবুজ সুরের ঐকতান।

তাই বোধহয় নিউক্লিয়ার চুল্লির বিজ্ঞান আর রাজনীতি উৎস মানুষ-এর বিষয় হয়ে যায়। 'প্রযুক্তি মানেই উন্নতি'—এই প্রচলিত রাজনৈতিক ধারণাকে বেমালুম গ্রহণ না করে বরং এক সংশয় থেকে শুরু করি আমরা। নিতান্ত সাদামাঠা মানুষের চাহিদা, প্রাপ্তি, বিপদ, অসুখ, বিপদের গভীরতা—এইসব প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা আর তথ্যের জট খুলতে খুলতে স্বতঃই আবিষ্কৃত হয়ে যায় সেই সিদ্ধান্ত—না, পরমাণু শক্তি চাই না। কিংবা, হাজারো পণ্যের ছয়লাপ আর বিজ্ঞানের চমক; তা থেকে পণ্যের সংস্কৃতিকে হাতেনাতে চিনে নিতে বুঝে নিতে চেয়েছে উৎস মানুষ। আর এই চাইবার প্রক্রিয়ায় সাবলীলভাবে এসে গেছে পুঁজিবাদী সমাজের চরিত্র, যে চরিত্র আরো বেশি প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে জনস্বাস্থ্য আর ওষুধ শিল্পের চূড়ান্ত জনবিরোধী পরিমণ্ডলে। এ সবই এসেছে বাস্তব অভিজ্ঞতা আর জ্বলন্ত তথ্যের বিশ্লেষণে, ছকে-বাঁধা তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত হিসাবে আসে নি।

আমাদের সামাজিক জীবন বহুবিধ বিধিনিষেধ আর প্রথা-অনুষ্ঠান-রীতি দিয়ে সজ্জিত, অলঙ্কৃত। আপন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতি রীতিমতো তৃপ্ত, গর্বিত। অথচ, প্রকৃত চিত্রটা কী? এইসব বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা, পার্বণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান এবং তার অনুষঙ্গে উপাচার উপহার ভোজনের আয়োজনে অপচয় অনাচার অমানবিকতা কেমন নিঃশব্দে মানুষে-মানুষে 'স্ট্যাটাসে'র ভেদ আর বৈষম্যের দেয়াল তুলে স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্ককে অসুস্থ করে; এবং কেমন অনায়াসে সেই বিকৃত সংস্কৃতি স্বাভাবিক জীবনচর্চার সঙ্গে মিশে যায়। তাই আমরা দেখি, প্রগতিশীল উচ্চশিক্ষিতের মনে পরিপূর্ণ নারী-পুরুষের ভেদ, বাবু-চাকরের ভেদ, ভদ্রলোক-ছোটলোকের ভেদ। এই হলো চিন্তার দৈন্য, আর মুক্ত চিন্তার দরজায় তালা ঝোলানোর প্রত্যক্ষ ফল। প্রথাগত শিক্ষা আর ঐতিহ্য থেকে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ অনড় ধর্মবিশ্বাসের মতো মস্তিষ্কে গাঁথা হয়ে থাকে, দৈনন্দিন আচরণের ক্ষেত্রে গতিশীল মুক্ত চিন্তা আর ক্রিয়া করে না, ফলে এক নিদারুণ বৈপরীত্য আমাদের সমাজ জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদ হাতে নীলা-পলা-তামা ধারণ করেন, জ্যোতিষচর্চা করেন; সমাজ পাল্টানোর স্লোগানে সোচ্চার জনগণের সাথী লড়াকু কর্মী কেমন অনায়াসে সংকীর্ণ, আত্মপ্রবঞ্চক, ধর্মভীরু। অর্থাৎ হাজারো শেকল। এই আমাদের অন্তঃপুরের অন্তস্থলে যে কুসংস্কার, পূজা-প্রকরণ, মন্ত্র-তন্ত্র-শক্তি-ক্ষমতা আর অতি-প্রাকৃতের মোহময় কুয়াশা, এগুলিই পাকে প্রকারে পল্লবিত হয়ে সংস্কৃতি, সমাজনীতি, রাজনীতির ব্যাপক পরিমণ্ডলে সক্রিয় হয়ে থাকে।

বিশ্বের সর্বত্রই সাধারণ মানুষের মুক্ত চিন্তা বিকশিত হওয়ার পথে রয়েছে প্রধান দুটো বাধা—একটা বাইরের, অন্যটা ভেতরের। বাইরের প্রতিবন্ধক হলো সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পুলিশ কিংবা কখনো রাজনৈতিক তত্ত্ব; আর ভেতরের বাধা ওই জমে থাকা অমোঘ বিশ্বাস আর অনড় মূল্যবোধ যা এক ভিত্তিহীন নিরাপত্তার আশ্বাস রচনা করে থাকে প্রাত্যহিক অভ্যাসে—সেখানে সংশয় বা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে গেলেই ভয় গ্রাস করে। সুতরাং এই ভয়, এই বাধা—একে ভাঙতে হয়, ভাঙতেই হয়।

ভাঙতে গেলে, নাড়াতে গেলেই হাজারো দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিভ্রম। কিন্তু শুরু তো এটাই। ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠী, সমাজ, দেশ—এই নিরন্তর দীর্ঘমেয়াদী লড়াই-এর সূত্রপাতে ক্ষুদ্র কাজটা আদৌ ক্ষুদ্র নয়। যে মানুষটি ধর্মসাক্ষীতে বিবাহ কিংবা গ্রহরত্ন ধারণ অথবা দেব-দ্বিজে ভক্তির মানসিকতা ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তার পদক্ষেপ পরিমাণে 'ছোট' হতে পারে কিন্তু প্রক্রিয়াটি তার নিজস্ব পরিবার বা পাড়া বা গোষ্ঠীর ভেতর আদৌ ছোট নয় বরং মহীরুহের সম্ভাবনায় বিরাট সে অঙ্কুর। এই মৃদু কম্পনটি আসলে বৃহত্তর সমাজ আর দেশের দিনবদলের মাদল-বোল, যা একদিনে আলোড়ন তোলে না, ক্রমশ ছড়ায় আর ছড়ায়।

সম্পাদকীয়

কুড়ি বছর হয়ে গেলো। এখন কার্তিকের মাসে ধানের ছড়ার পাশে রাসায়নিক বিষ। অনেক নরম নদীই শুকিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সোনালি ডানার চিল। কেউ তারা আর ফিরে আসে না। প্রকৃতির, সমাজের, মানুষের দিকে বিশেষ কেউ আর তাকাতে চায় না। তবু... ।

না আসুক শ্রাবস্তীর কারুকার্য-করা কোনো বনলতা সেন, না আসুক কুড়ি বছরে কিশোর থেকে লোক হয়ে যাওয়া দায়বদ্ধতা-হারানো বন্ধুরা, তবু উৎস মানুষ তার অকৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য নিয়ে চলে এসেছে কুড়ি কুড়ি বছরের পারে— সেই ধানসিড়িটির তীরে, বাংলার ঘাস জল মাটি আর মাটির মানুষের পাশে পাশে, পরিচ্ছন্ন মুক্ত এক মনস্কতা গড়ে তোলার স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

দুই দশকে অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংগঠনিক পরিবর্তন হয়েছে ; অনেক সমস্যা সংকট দুর্বিপাক গেছে। অন্যদিকে আবার এতকাল ধরে অটুট রয়ে গেছে কাছের দূরের অজস্র পাঠকবন্ধুদের আত্মীয়তার উষ্ণতা। এইসব ঝড় বরিষন মলয় সমীরণের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিণত একটি 'কমিটেড' লিটল্ ম্যাগাজিন, দু দশক ধরে নিরবচ্ছিন্ন সাবলীলতায় বেঁচে থেকে আরব্ধ দায়িত্ব পালন করার পর, বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রশ্রয় পেতেই পারতো। ইতিহাসে এরকম হয়-ই, একটি পত্রিকার স্বাভাবিক সমাপ্তি ঘটে সময়কে জায়গা করে দিতে। কিন্তু উৎস মানুষ বোধহয় পেয়ে গেছে অন্য কোনো জীবনীশক্তি। শক্তি সদিচ্ছার, শুভেচ্ছার। এই অমূল্য প্রেরণাশক্তির জোগান আসে গ্রামগঞ্জ মফঃস্বলের সক্রিয় ছোট ছোট গণসংগঠনের থেকে এবং কিছু আশাবাদী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সমাজসচেতন মানুষের থেকে। এঁদেরই তাড়না কিংবা প্রেরণায় উৎস মানুষের থেমে যাওয়া আর হয় না। নতুন শতাব্দীতে চলা শুরু হয় ফের, নতুন আঙ্গিকে, নতুন সময়ের মুখোমুখি হতে। অতএব...চরৈবেতি। চরৈবেতি।

একবিংশ বর্ষ,
প্রথম সংখ্যা
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
২০০০-এ প্রকাশিত

মৃত্যুর পর নশ্বর শরীরটা বিজ্ঞানের কাজে লাগুক—মনে প্রাণে চাইতেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৮ সালের ২৯ অক্টোবর কিছু স্বাস্থ্যকর্মীর অমানবিকতায় মৃত্যু হয় ছোট্ট শৌভিক সামন্তের। বন্ধু তথা উৎস মানুষের সহযোদ্ধা চিত্ত সামন্তর এই ভাইপোর মৃতদেহ তার পরিবার তুলে দেয় নীলরতন সরকার হাসপাতালের অ্যানাটমি বিভাগে। পুরো উদ্যোগটার নেপথ্যে সক্রিয় ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজও দোতলায় অ্যানাটমি বিভাগে কাচের বাক্সে রাখা আছে শৌভিকের অস্থি-কাঠামো। তার গায়ে যেটি লেখা আছে সেটিও লিখে দিয়েছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখাটি এরকম—

জন্মদিন : ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
মৃত্যু : ২৯শে অক্টোবর ১৯৯৮

শৌভিক সামন্ত,

'পাঁচ বছরের ছোট্ট শৌভিক অসুস্থ অবস্থায় ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, জীবনে প্রথম কলকাতায় আসবার পথে বাবার কাছে আবদার করে যে সে কলকাতাতেই থাকবে। SSKM ব্লাড ব্যাঙ্কের কিছু স্বাস্থ্যকর্মীর অমানবিকতায় শৌভিক বাধ্য হয় নিজের জীবনের সমাপনে, ২৯শে অক্টোবর ১৯৯৮।

শৌভিকের সেই আবদারকে মর্যাদা দিতে এবং এই অমানবিকতার প্রতিবাদস্বরূপ মানবিকতার এক চূড়ান্ত নিদর্শন হিসাবে শৌভিকের ভগ্নহৃদয় পিতা চিরঘুমন্ত শৌভিককে তুলে দিলেন N.R.S. Medical College-এর অ্যানাটমি বিভাগের হাতে। দৃষ্টিহীনদের কথা মাথায় রেখে স্বপ্নমাখা চোখ দুটি তুলে দিলেন Calcutta Medical College-এর- R.I.O বিভাগে, গণদর্পণের সহায়তায়। যেখানে ছোট্ট শৌভিক এইটুকু জীবনেই হয়ে উঠল মানবতার যথার্থ প্রতীক।

আজকের দিনে যারা শৌভিকের এই অস্থি-কাঠামোকে সামনে রেখে মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চলেছেন মানবজগৎ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে তাঁরাও এইভাবে উদ্বুদ্ধ হোন।

এইটুকু আমাদের একান্ত ইচ্ছে।

সামন্ত পরিবার, হটন রোড,
আসানসোল।

এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ দাবি বাঁচার দাবি ?

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

পতিতাবৃত্তি (প্রস্টিটিউশন) কে স্বীকৃত পেশা বা ব্যবসা হিসেবে আইনী বৈধতা দিতে হবে এ দাবির কথা উঠেছে সম্প্রতি, উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের যৌনকর্মী মহল থেকে। সত্যি বলতে কি, একজন সাধারণ বঙ্গদেশীয় মধ্যবিত্ত হয়ে, এরকম একটা দাবির কথা শুনলে প্রথমে শিউরে উঠতে হয়— সে কি! বেশ্যাবৃত্তি আর- পাঁচটা পেশার মত সমাজগ্রাহ্য হবে নাকি! ঘরের মা বোন মেয়েরা প্রকাশ্যে এই দেহব্যবসার লাইসেন্স পাবে ? তাহলে সমাজ উচ্ছন্নে যেতে আর বাকি থাকে কি!

জানি, এই শিহরন এই বিস্ময় আমাদের অন্তরের ঐতিহ্য-লালিত সংস্কারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। সমাজের সুস্থতা শুচিতা সৌন্দর্য সম্পর্কে যে ধারণা, যে মূল্যবোধ, প্রজন্ম পরম্পরায় আমাদের কালচারে রয়ে গেছে, সেখানে ধাক্কা লাগে, সর্বনাশের শঙ্কায় শঙ্কিত হই আমরা।

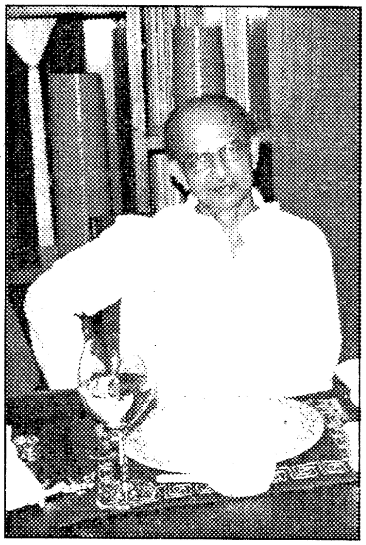

তবু ভাবতে হয়, বিচার করে দেখতে হয়। এবং সে বিচার যেমন সংস্কারমুক্ত সহানুভূতিশীল মন নিয়ে করা দরকার, তেমনি সার্বিক যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতেও হওয়া দরকার, না হলে সত্যটাকে চেনা যায় না।

সমাজে বারবণিতাদের অবস্থান বহু প্রাচীন কাল থেকে। পুরুষের বিকৃত যৌনকামনা, অতৃপ্ত বাসনা, উচ্ছৃঙ্খলতা আর অবৈধ আশ্রয়ের প্রয়োজনেই বারবণিতাদের সমাজের অন্ধকারে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।... তবু কালের প্রবহমানতা অনেক আলোড়ন ঘটায়, অনেক পরিবর্তন বয়ে আনে, যেমন হয়েছে এই পতিতাকুলের ক্ষেত্রেও।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরা যাক। কবে কীভাবে যৌনব্যবসার সূত্রপাত হয়েছিল জানার উপায় নেই। চলে এসেছে ক্রমবর্ধমান হারে, মূলত দারিদ্র্য, অসহায়তা, আর পুরুষের প্রবঞ্চনার হাত ধরে। কোনো রমণীই স্রেফ মজা-ফূর্তির জন্য কিংবা তথাকথিত 'দুশ্চরিত্রা' হওয়ার কারণে বেশ্যাবৃত্তির লাইন-এ আসেনি। যদি বা কেউ বেহিসাবী প্রলোভনে কিংবা মিথ্যে আশ্বাসের ফাঁদে পড়ে এ ব্যবসার বৃত্তে চলে এসেছে, অচিরেই সে এই নির্দয় নরকবাস ছেড়ে পালাতে চেয়েছে, পারেনি। মালিক-মাসী-দালাল-মস্তানের চক্রব্যূহে আটকে পড়েছে।

ছোটবেলা থেকেই আমরা দেখে আসছি মুখে কড়া স্নো-পাউডার-সুর্মা-কাজল মেখে, উত্তেজক রঙচঙে পোষাকে সেজে, গলির মোড়ে পার্কের ধারে, আধো অন্ধকারে খদ্দের ধরার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে কিছু মেয়ে। বড়রা বলেছে, ওরা বেশ্যা। ওরা ঘৃণ্য, পাপিষ্ঠ, সমাজতাড়িত। ওদের পল্লী নিষিদ্ধ, ভদ্রভাষায় 'রেড লাইট এরিয়া'। অতএব সাধারণ সমাজের সমতা সহানুভূতি ওদের কখনোই প্রাপ্য নয় ; ওদের সখ-আহ্লাদ, চাহিদা, অধিকার, দাবি কিছুই যেন নেই, থাকতে নেই।

রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কোন ছাড়, ভারতের আইন 'বেশ্যাবৃত্তি'কে কোনোরকম অনুকম্পা বা সহানুভূতি দেয় নি। না দেওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে আইনশাস্ত্রে। বলা হয়েছে, এই প্রাচীন পেশা সাধারণ বিশ্ববাসীর কাছে অবাঞ্ছিত, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ৪ ও ৫ নং ধারার প্রত্যক্ষ বিরোধী ; এবং ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কলঙ্কজনক। পতিতা-পেশার আইনী বাস্তবতা প্রসঙ্গে ১৯৯৭ সালে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এক রায়-এ বলেছেন, "পতিতাবৃত্তি এক মনুষ্যত্ব-বিরোধী অপরাধ, মানবাধিকারের প্রত্যক্ষ লঙ্ঘন, ভারতীয় আইনের চোখে সমাজ-দূষণকারী এক পেশা। সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে এই নিকৃষ্ট বৃত্তি বজায় থাকা অতি সংবেদনশীল একটি বিষয়—সমাজ থেকে এই পেশা নির্মূল করার সদিচ্ছা সরকারের থাকা উচিত।" সরকার অদ্যাবধি কী পদক্ষেপ নিয়েছে ?

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত 'পিটা' আইন (Prevention of Immoral Traffic Act) লাগু করেছে। কাগজে-কলমে এই অ্যাক্টের উদ্দেশ্য হল বেশ্যাবৃত্তির মত অমানবিক ব্যবসাতে মেয়েদের ঢোকা বন্ধ করা, সমাজের 'শুচিতা' রক্ষা করা। অথচ বড় মজার এই আইনের বাস্তব প্রয়োগরীতি : রাস্তায় বা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে খরিদ্দার ধরার চেষ্টা করলে পুলিশ ধরবে, কিন্তু ঘরের ভেতরে লুকিয়ে চুরিয়ে ভদ্রতার ভনিতা রেখে বেশ্যাবৃত্তি চালালে সেটা 'পিটা' আইনের নাগালের বাইরে থাকবে। এই বকচ্ছপ মার্কা আইনী শাসনের বাস্তব চেহারাটা দাঁড়িয়েছে এই—'হতভাগ্য' দরিদ্র মেয়েদের গণিকাবৃত্তিতে চলে আসার মূল কারণকে দূর করা নিয়ে মাথাব্যথা নেই পুলিশ প্রশাসন-আইন-নিয়ামক বা রাজনৈতিক কর্তাদের। বরং দেহ বিক্রির অবৈধ ব্যবসা চালু থাকলে কর্তাদের পোয়াবারো। পিটা প্রয়োগের নাম করে যখন তখন অরক্ষিত মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়া, তোলা নেওয়া, যথেচ্ছ নারীদেহ ভোগ করা, অত্যাচার করা তৎপর পুলিশী শাসনের পরিচিত চিত্র। অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানে যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের উপদেশ সরকারের প্রতি রয়েছে, কার্যক্ষেত্রে সেগুলি মোটা মোটা আইনি কেতাবের ভেতরেই ছাপার অক্ষরে বন্দী রয়ে গেছে।

'বেশ্যা', 'পতিতা', 'গণিকা', 'খানকি' ইত্যাদি নামকরণের মধ্যেই সমাজের চূড়ান্ত ঘৃণা প্রকাশ পায়। এইসব অসহায় নারীরাও যে রক্তমাংসের মানুষ, তাদেরও যে মন আছে, চোখের জল আছে, সে বোধ সমাজে বিশেষ জায়গা পায়নি বহুকাল। পরিবর্তনের একটা বাতাস, বোধ করি, এ রাজ্যে আসতে শুরু করে সত্তর দশকের বৈপ্লবিক তুফানের অনুষঙ্গ হিসেবে। নতুন রাষ্ট্র নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্নের জোয়ার সে

সময় নিম্নবর্গের নিপীড়িত অবহেলিত মানুষকে মূলস্রোতের 'সভ্য ভদ্র' সমাজের অনেকটা কাছাকাছি এনেছিল এবং সেই সময়, আশির দশকে, কাকতালীয়ভাবে বিশ্বজুড়ে এডস্ (AIDS) রোগের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল ; রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নানা দেশি-বিদেশি প্রকল্প দ্রুত সক্রিয় হয়েছিল ; শুরু হয়েছিল এডস্ সংক্রমণের অন্যতম উৎস বলে চিহ্নিত পতিতাপল্লীগুলির অন্দরমহলে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মসূচী। এর ফলে অনিবার্যভাবে মনোযোগ পেয়েছিল এতকালের "অচ্ছুৎ" দেহপসারিণীরা।

কালান্তক ব্যাধি এডস্-এর সঙ্গে এখন লড়াই-এ নেমেছে সারা বিশ্ব। আমাদের রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের গোড়াতে বিশেষ হেলদোল না থাকলেও 'জাতীয় এডস্-নিয়ন্ত্রণ পরিষদ' (NACO), 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO), DFID, UNAIDS, USAID, CIDA ইত্যাদি সংস্থার বিপুল অর্থ সাহায্য আসতে থাকে এডস্ প্রকল্পে, বিশ্বব্যাঙ্কের ছাড়পত্র নিয়ে। ১৯৯২ সালে দেশে এনেছিল ৩০ কোটি মার্কিন ডলার, ১৯৯৮ সালে ৩২ কোটি (১৪২৫ কোটি টাকা) পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায়। এত টাকার ঢল, মৌমাছির মত উদ্যোগী সংস্থারা নামে-বেনামে এসে ভিড় করবে-এতে আর আশ্চর্যের কী আছে! রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এত বড় প্রকল্প রূপায়ণের পরিকাঠামো নেই, তাই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের (NGO) সুযোগ দেওয়া হয়। প্রথমদিকে, ৯০-এর গোড়ায়, পশ্চিমবঙ্গে তিন-চারটি সংস্থা কাজ করছিল, ৯৮ সালে ৮৮টি. এন. জি. ও. সরকার মারফৎ অর্থ সাহায্য পেয়েছে ; বর্তমানে এ সংখ্যা শতাধিক। গণিকাদের সচেতন করে তোলা, সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, হাতের কাজ, পল্লীর পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, কন্ডোম ব্যবহারে উৎসাহ দান, 'নিষিদ্ধ পল্লী'র শিশুদের ও বড়দের প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা—এরকম বহুবিধ 'প্রজেক্ট' নিয়ে ভালোরকম অর্থ সাহায্য জোগাড় করে এন. জি. ও.-রা। লক্ষ্য করার বিষয় হল, এত সব প্রকল্পের মধ্যে এডস্ রোগীদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসালয়, কিংবা পতিতাবৃত্তির মূল কারণ দূরীকরণ নিয়ে কোনো প্রকল্প নেই।

আশির দশকে, কাকতালীয়ভাবে বিশ্বজুড়ে এডস্ (AIDS) রোগের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল ; রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নানা দেশি-বিদেশি প্রকল্প দ্রুত সক্রিয় হয়েছিল ; শুরু হয়েছিল এডস্ সংক্রমণের অন্যতম উৎস বলে চিহ্নিত পতিতাপল্লীগুলির অন্দরমহলে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মসূচী। এর ফলে অনিবার্যভাবে মনোযোগ পেয়েছিল এতকালের "অচ্ছুৎ" দেহপসারিণীরা।

এন. জি. ও.-দের টাকা নিয়ে নয়ছয়, হিসেবে কারচুপি, রিপোর্টে তথ্য-বিকৃতি ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা যথেষ্ট শোনা যায়। তার সবটা না হলেও খানিকটা হয়তো সত্যি। অর্থের অবাধ যোগান এলেই তার হাত ধরে অনর্থ আসে। তাই কেচ্ছা কেলেঙ্কারিও হয়। সে অন্য গল্প। আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

গত পনের-কুড়ি বছরে পতিতাদের সামনে রেখে উঠে এসেছে বহু এন. জি. ও.। বহু ডাক্তার, শিক্ষিত তরুণ-তরুণী চাকরি পেয়েছে, সরকারি-বেসরকারি কর্তাব্যক্তিরা ডলারের প্রসাদ হাত ভরে নিয়েছে, এদেশ-ওদেশ উড়ে বেড়ানোর সহজ সুযোগ মিলেছে, কাগজে, টিভি'তে ছবি উঠেছে, প্রচার পাওয়া গেছে। আর ওরা? যাদের জন্য এত প্রাপ্তি, সেই চিরলাঞ্ছিত পণ্য নারীরা কী পেয়েছে? ... সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি সেই একই করুণ চিত্র ; রাস্তায় ময়দানে পার্কে স্টেশনে মধ্য-নিম্নবিত্ত 'লাইনের' মেয়েদের ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি—দারিদ্র্য, বেকারত্ব, রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। অন্যদিকে 'এডস্ প্রিভেনশন সোসাইটি' আর 'ন্যাকো'র পরিসংখ্যান বলছে : পশ্চিমবঙ্গে এডস্ রোগের প্রাদুর্ভাব বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে : ১৯৮৬ সালে এ রাজ্যে প্রথম এডস্ রোগী ধরা পড়ে, তারপর থেকে আমাদের জনদরদী বাম জমানাতেই কালান্তক রোগটি বেড়ে চলেছে অবাধে। ২০০০ সালে পাওয়া গিয়েছিল ২২১ জন এডস্ রোগী, ২০০৩-এ সে সংখ্যা হল ৬১১, আর এ বছরে (২০০৫) ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চিহ্নিত রোগী ২৩৯৭ জন। এই রোগ বিস্তারও হয়েছে প্রধানত ওই 'পতিতা' নারীদের শরীরেই। দুঃখের ধারাপাতে মুক্তির পরিবর্তে এটাই হয়েছে ওদের পাওনা।

তবু কিন্তু পেয়েছে ওরা অন্য এক-ধন। বাইরের আবরণে বা অর্থের পরিমাপে নয়, পেয়েছে আপন চেতনার জগতে। গত দেড় দু' দশকের পতিতা-কেন্দ্রিক ছোট-বড় কর্মকাণ্ডগুলোর সুবাদেই ওরা অন্ধকার থেকে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে ; 'বেশ্যা' নামক ঘৃণিত পরিচয়ের জায়গায় 'যৌনকর্মী' নাম পেয়েছে, 'মানুষ' হিসেবে কিছু মর্যাদাবোধ খুঁজে পেয়েছে ; নিজেদের সন্তানদের বাঁচার কথা, অধিকারের কথা, চাহিদার কথা বলার জোর সঞ্চিত করতে পেরেছে ওদের অনেকেই।

প্রথম যে বড় পরিবর্তনটা এলো ৮০-র মাঝামাঝি, সেটা হল আত্মনির্ভরতার প্রত্যয়। এতদিন এন. জি. ও.-র স্যার, ভদ্রলোক দাদা-দিদিমণি'দের পেছন পেছন ঘুরে পল্লীর কর্মী মেয়েরা রোগ ছড়ানোর কারণগুলো জেনেছে, সাথীদের কন্ডোম ব্যবহারে সচেতন করেছে, পাড়ার ভেতরে স্বাস্থ্য-ক্লিনিক পাঠশালা চালাতে এন. জি. ও.'দের সাহায্য করেছে। তবু নিজেদের নিরাপত্তা পাচ্ছিল না তারা। দালাল-মাসী-মস্তান-পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে টক্কর দেওয়া যাচ্ছিল না। বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদে আরো বেশি মারধোর জুলুম হচ্ছিল। এরকম সময় এক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললো শেঠ গলির মেয়েরা ; সাহসী কয়েকজন মেয়ে মিলে সেদিন শেঠ গলি'র কুখ্যাত 'ল্যাংড়া মস্তান'কে বেধড়ক ঠ্যাঙালো সবার সামনে। উল্টে প্রচুর মার খেলো, রক্তারক্তি হল বটে কিন্তু সেই প্রথম ওখানে মস্তানরাজ থমকালো। গলির মেয়েরা নতুন জোর পেল। গড়ে উঠলো যৌনকর্মীদের প্রথম একান্ত নিজস্ব সংগঠন 'মহিলা সংঘ', ১৯৮৭ সালে।

মূক মুখে ভাষা, বাসনা, এবং দাবি-দাওয়া

'উৎস মানুষ' পত্রিকার মার্চ ১৯৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল মহিলা সংঘের সচিব আশা সাধুখাঁ'র খোলা চিঠি : "সাদা কথায় আমরা বেশ্যা। ভদ্রবাবুদের ভাষায় পতিতা। ... শুনেছি (আমাদের নাম করে) কোটি কোটি টাকা আসছে দেশ-বিদেশ থেকে। টাকা মানেই ব্যবসা। তবে মা-বোনেরা এটা নিশ্চই মানবেন আপনাদের ভাঙিয়ে কেউ ব্যবসা চালালে সেটা আপনারও ভালো লাগবে না। ... আমাদের সব গেছে, এখন একটাই স্বপ্ন—আমাদের বাচ্চারা যাতে মানুষ হয়, তাদের যেন কোনদিন এ-পেশায় জড়িয়ে পড়তে না হয়।"